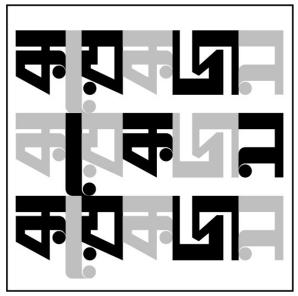

কয়েকজন বাংলাদেশি
কবি-শিল্পী ও সাহিত্যকর্মী

কয়েকজন বাংলাদেশি কবি-শিল্পী ও সাহিত্যকর্মী

আহমদ রফিক

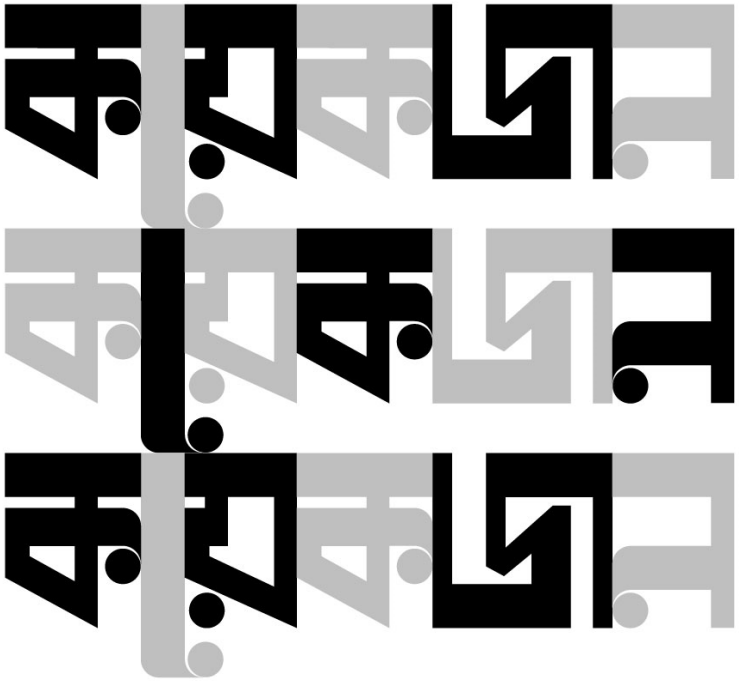

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২-১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Koyekjon Bangladeshi Kobi-Shilpi O Sahittokormi by **Ahmad Rafique**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021
Price : 300.00
US $ 15
ISBN 978 984 95481 5 7

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

গবেষণাগ্রন্থ ‘যমুনা’-রচয়িতা বহুমাত্রিক কথাশিল্পী
ড. মোহাম্মদ আলী খান
প্রিয়বরেষু

ভূমিকা

কয়েক দশক আগে থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের তৎকালীন তর"ণ এবং ভিন্নবয়সি কারো কারো কবিতা নিয়ে যে-কটি প্রবন্ধ লিখেছি সেগুলো ছড়িয়েছটিয়ে থাকায় হারিয়ে যাওয়ার পথে। সম্প্রতি প্রকাশকের তাগিদ সেগুলোকে গ্রন্থবদ্ধ করে স্থায়িত্ব দেওয়া। সেগুলোকে গোছগাছ করতে গিয়ে এবং সংখ্যাস্বল্পতার কারণেও মনে হলো এ জাতীয় আরো কিছু লেখা এখানে যুক্ত করা যেতে পারে যেগুলো ভিন্নধর্মী, যেমন— সাহিত্যকর্ম, গান ও সুরের মনীষীবিষয়ক সৃষ্টিকর্ম, কিংবা সুরের অনুশীলনে মগ্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে দু-চারটে গুর"ত্বপূর্ণ রচনা, বাদ যায় না কথাসাহিত্য।

এগুলো পরিকল্পিত রচনা নয়, লেখা কখনো অনুর"দ্ধ হয়ে, কখনো নিজের ভালো লাগার তাগিদে। কিন্তু কোনোটিতেই আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। ছিল না পক্ষপাতিত্ব। যেমন বুঝেছি, তেমনই লিখেছি; বলা যায় ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের আদর্শে নিরপেক্ষতাকে মান্য করে।

যেহেতু অনেক কটি লেখা দীর্ঘকাল পরে গ্রন্থে সংকলিত হতে যাচ্ছে, তাই সেগুলোর সংশি- ষ্ট ব্যক্তিগণের কারো চুলে ধূসর আভা, কেউ বর্ষীয়ান, দু-একজন প্রয়াত, আবার কেউ তার"ণ্য-অতিক্রান্ত। তাতে কিছু যায়-আসে না, বরং বৈচিত্র্যেরই প্রকাশ ঘটায়।

এমন একটি সংকলনগ্রন্থের রচনাবিন্যাস যেমন খুবই কঠিন কাজ, তেমনই কঠিন এর নাম নির্ধারণ। অনেক ভাবনার পর প্রবন্ধগুলোকে সংশি□ষ্ট ব্যক্তির বয়ঃক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনে হয়, তাতে কারো পক্ষে আপত্তির কোনো কারণ ঘটবে না। বইয়ের নামটিও একই কারণে সাদামাটা ভাষ্যে স্থির করা হলো 'কয়েকজন বাংলাদেশি কবি-শিল্পী ও সাহিত্যকর্মী'। সবশেষে একটি কথা এ সংকলনগ্রন্থের বিন্যাসে আমার চিন্তায় ছিল কবিতারই প্রাধান্য। রচনাগুলোর বিন্যাসগত আকাঙ্ক্ষিত ক্রমিকতা রক্ষার প্রয়োজনে

কবিতার অগ্রগণ্যতা রক্ষা করা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি।

যেহেতু সংকলনটি পূর্ব রচিত প্রবন্ধ এবং কয়েকটি সাম্প্রতিক রচনার মিশ্র রূপ, পরিকল্পিত কবি ও তাদের কাব্যবিষয়ক রচনার নির্বাচন নয়, স্বভাবতই অনেক প্রিয় কবি বা খ্যাতিমান কবি এখানে অনুপস্থিত, সেজন্য আমি দুঃখিত। এটা নেহাতই বিচ্ছিন্ন কয়েকটি রচনার অপরিকল্পিত সংকলন। তাই এখানে প্রয়োজনের তাগিদে ভিন্নধর্মী কয়েকটি রচনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাতে সংকলনটি সমৃদ্ধ হয়েছে বলেই আমার ধারণা। সবশেষে সাম্প্রতিক কবিতাবিষয়ক একটি রচনা বিশেষ উদ্দেশ্যে সংযোজিত, বইয়ের আয়তন বৃদ্ধির জন্য নয়। অনিবার্য কারণে এদের সমকালীন যাদের নাম বাদ পড়ে গেছে তাদের নিয়ে অন্তত কিছু কথা বলা অপরিহার্য বিধায় এই প্রবন্ধটির সংযোজন।

বলা দরকার রচনাগুলো ব্যক্তিগত রচনাধর্মী, কবি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়, অন্যদের সম্পর্কেও একই কথা খাটে। পাঠক লেখাগুলোকে সেভাবে বিবেচনা করলেই সুবিচার করা হবে।

বইটি প্রকাশের জন্য অনিন্দ্য প্রকাশের স্বত্বাধিকারী আমার বইয়ের মূল ভান্ডারি জনাব মোঃ আফজাল হোসেনকে অশেষ ধন্যবাদ।

আহমদ রফিক

সূচিপত্র

বহুল প্রাপ্তিতেও সহজ-সারল্যের প্রতীক ওবায়েদ-উল হক ১১
সাংবাদিকতার প্রবল টানে সাহিত্যের মন্দভাগ্য ১৮
অনন্য এক রবীন্দ্র-নজরুলসংগীত গবেষক ২৫
কবিতায় জীবন ও দ্রোহ, নিসর্গ ও রাজনীতি ৩৬
কাদেরী কিবরিয়া : ব্যতিক্রমী ধারার সংগীতশিল্পী ৫৪
শব্দের সৃষ্টিশক্তিতে বাস্ড়ব ভুবন পরিক্রমায় বিমল গুহ ৬১
গণতন্ত্রকামী অনন্য মিডিয়া-ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ৬৯
বাস্তবতার জমিতে দাঁড়ানো নান্দনিক কবি ৭৬
নারীকে ঘিরে প্রেমের কবিতায় প্রাকৃত চেতনা ৮৬
সাম্প্রতিক ধারার মধ্যেই ব্যতিক্রমী এক কবিসত্তা ৯১
মেধাদীপ্তিতে অনন্য এক সাহিত্যগবেষক ও কবি ৯৭
লোকায়তিক সরোবরে নাগরিক কবির অবগাহন ১০৪
আমিনুল ইসলামের কবিতার বিষয় ও প্রকরণ বৈচিত্র্য ১১১
খালেদ হোসাইনের কবিতায় চৈতন্যের নানামাত্রিক প্রকাশ ১১৯
নিসর্গাশ্রয়ী জীবন ও ভালোবাসার কবিতা ১২৫
বিশ্বপরিক্রমায় সমাজ সচেতনতার প্রকাশ ১২৯
ব্যতিক্রমী ধারার কবি পিয়াস মজিদ ১৩৪
তরুণ কথাসাহিত্যিকের অনন্য কথকতা ১৩৯
সাম্প্রতিক কবিতায় বিচ্ছিন্ন ধারার নান্দনিকতা ১৪৬

বহুল প্রাপ্তিতেও সহজ সারল্যের প্রতীক ওবায়েদ-উল হক

ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত বিকেলে যখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি হলের পেছনের বারান্দায় 'ছায়া ঘনাইতে' শুরু করেছে, সেখানে একটি খাটিয়ায় শায়িত একুশের প্রথম শহিদ রফিকউদ্দিন, সেসময় একজন প্রায়-মধ্যবয়সি সুদর্শন ভদ্রলোক সেদিকে ধীরপায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তার সঙ্গে কলেজের সিনিয়র ছাত্রী হালিমা আপা। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট।

সেই বিকালে একাধিক ব্যক্তি শহিদ রফিকউদ্দিনকে দেখতে গেছেন, কেউ কেউ ছবি তুলেছেন; যেমন আমানুল হক-সহ অন্তত দুজন মেডিক্যাল ছাত্র। শেষোক্তদের তোলা ছবির কপি আমার সংগ্রহে ছিল, যা পরে ড. এনামুল হকের অনুরোধে আরো অনুরূপ ছবির সঙ্গে জাতীয় জাদুঘরে জমা দেই। পূর্বোক্ত ভদ্রলোক ছবি তুলেছিলেন কি না জানি না।

পরে হালিমা আপার কাছে শুনেছি, তিনি সাংবাদিক ওবায়েদ-উল হক, ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত। একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের বর্বর ঘটনায় হতাহতদের সম্পর্কে খবর নিতে তিনি নিজেই আরো অনেক খ্যাতনামার মতো অকুস্থলে চলে আসেন।

পূর্বোক্ত সূত্রে আরো জানতে পারি, তিনি কলকাতার বিখ্যাত 'দৈনিক স্টেটসম্যান' পত্রিকার ঢাকাস্থ সংবাদদাতা। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিবন্ধকারে পাঠিয়ে থাকেন ওই পত্রিকায়। সম্ভবত সে কারণেই তিনি নিজেই এসেছিলেন সঠিক সংবাদ জেনে নিতে। সেগুলো আন্দোলনকালে 'স্টেটসম্যান'-এ ছাপা হয় সংগত গুরুত্বে।

আর ঘটনার কী বিষয়, দীর্ঘকাল পর আমি স্টেটসম্যান-এ প্রকাশিত সেসব খবর সম্পাদকীয়সহ সংগ্রহ করি ওই পত্রিকার সাংবাদিক কবি-কথাসাহিত্যিক অসীম রায়ের সৌজন্যে। কর্তিকা নয়, টাইপ করা বেশ কয়েক পাতা সংবাদ ও সম্পাদকীয়। বলতে হয়, এভাবে সাংবাদিক ওবায়েদ-উল হকের সঙ্গে আমার নান্দনিক সম্পর্কের সূচনা। কারণ সেদিন বিকেলে তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়নি, পরিচয়ও হয়নি। একটু দূর থেকে দেখেছি ধীরস্থির প্রশান্ত স্বভাবের মানুষটিকে। এ মূল্যায়ন অবশ্য পরবর্তীকালের।

দুই

পরবর্তীকালেও তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। হয়তো দুজন দুই ধারার বলে, তাছাড়া বয়সের পার্থক্যটাও তো কম নয় (১৮)। তাই তার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি খুবই কম, স্মৃতিকথা লেখার উপাদানও তাই। তবু মাঝেমধ্যে দেখা হয়েছে, সে অভিজ্ঞতায় দেখেছি সুরসিক মানুষটিকে, আলাপচারিতায় আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তার মুখেই আমি প্রথম শুনি, সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে 'ফোর্থ এস্টেট' কথাটি; ইতঃপূর্বে অজানা শব্দটি তার কথায় একাধিক বার শুনেছি। আর উপলব্ধি করেছি সংবাদমাধ্যমের শক্তি ও সামাজিক গুর"ত্ব সম্পর্কে তার শ্রদ্ধাবোধ, যা যে-কোনো সাংবাদিকের জন্য অপরিহার্য।

একটি চমকপ্রদ ছোট্ট তথ্য কাকতালীয়ভাবে তুলনীয় বলেই উদ্ধৃত করছি, তার স্মৃতিচারণ পড়তে গিয়ে অবাক হলাম, তার সময়ের মতো আমাদের স্কুলছাত্র জীবনে (চলি-শের দশক) প্রচলিত কথা— 'ইংরেজিটা ভালোভাবে রপ্ত করতে স্টেটসম্যান পত্রিকাটা ছাত্রদের পড়া দরকার। তার মতো আমিও স্কুল লাইব্রেরিতে বসে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করেছি স্টেটসম্যান পড়ে, যদিও অনিয়মিত। ইংরেজিটা রপ্ত হয়েছে কি না বলা কঠিন। তবে ওবায়েদ-উল হক সাহেবের নিশ্চয়ই হয়েছিল।

তার সাংবাদিক জীবনের পেশাগত উৎকর্ষ তার প্রমাণ। কথায় কথায় তার কিছু উক্তি রীতিমতো স্মরণীয় চরিত্রের। তার ওই স্মৃতিকথা 'কীর্তিমানের স্মৃতিবিলাস' পড়তে গিয়ে শুর"তেই একটি অসাধারণ উক্তিতে দৃষ্টি আটকে গেল। জীবন সম্পর্কে বহু 'কীর্তিমান' বা খ্যাতিমান ব্যক্তি অনেক চমকপ্রদ উক্তি করে গেছেন, যা কালজয়ী

হওয়ার যোগ্য। জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে ইংরেজিতে ওবায়েদ-উল হক সাহেবের লেখা তেমন একটি বাক্য আমার কাছে অসাধারণ সত্যের মতো প্রতিভাত হলো। তার কথা : মানুষকে বলা হয়— 'a traveller between life and death।'

এর চেয়ে নির্মম, অপ্রিয় সত্য আর কিছু হতে পারে না। আমি যে কবার তার মুখোমুখি হয়েছি, তার আলাপে দেখেছি ইংরেজির প্রাধান্য। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় অন্য বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি সত্ত্বেও ইংরেজিটা বোধহয় তার প্রিয় বিষয় ছিল, তেমনি সে পরিমাণ আয়ত্তেও ছিল। তদুপরি ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিকতা ও সম্পাদনা। হয়তো তাই তার আলাপচারিতায় ইংরেজিটা এক পা এগিয়ে ছিল, কিন্তু বাংলাকে উপেক্ষা করে নয়। তার বাংলা লেখাও ছিল যথেষ্ট মাত্রায় স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল।

তার ভাষায় 'পঞ্চাশ বছরের সাংবাদিক জীবন', যেমন কেটেছে পেশাদারিত্বে, তেমনি 'ভালোবেসে'। 'পাকিস্তান অবজার্ভার' থেকে 'দৈনিক বাংলা'— প্রেস ট্রাস্ট থেকে প্রেস ইনস্টিটিউট, ফোর্থ এস্টেটেরই নানাদিকের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন আমৃত্যু। সাংবাদিকতার মানোন্নয়নের দিকেও নজর ছিল তার। যাপন করেছেন একটি বর্ণাঢ্য সাংবাদিক জীবন। এরই মধ্যে অভিনব ভিন্নতা— সে প্রসঙ্গ পরে আসছে।

প্রেস ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ছিল গভীর সম্পর্ক, চেয়ারম্যান ছিলেন এক সময়। সন তারিখ মান নেই একবার সেখানে সম্ভবত তিন দিনের কর্মশালা— বিষয় সাংবাদিকতার মান। অংশগ্রহণে সাংবাদিকের তুলনায় লেখক সংখ্যা কম ছিল না। যে কারণে হোক তাতে অংশগ্রহণে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। মূল প্রবন্ধ পাঠ অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের। সুলিখিত ওই প্রবন্ধের ভিত্তিতে আলোচনা। চেনামুখ প্রায় সবাই, মনে পড়ছে শুধু মনসুর মুসা, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, লুৎফর রহমান প্রমুখের কথা এবং স্বয়ং ওবায়েদ-উল হক সাহেব। বন্ধু লুৎফর তখন সেখানকার ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক।

কর্মশালায় বক্তৃতা, বিতর্ক আলোচনা খুব জমেছিল সংবাদমাধ্যম কয়েকপ্রস্থ ধোলাইয়ে। যেমন সংবাদ পরিবেশনে, তেমনি বিশেষভাবে সংবাদ অনুবাদে। এক্ষেত্রে উদাহরণ-সহ ওবায়েদ সাহেবের সরস

বক্তব্যে মিলনায়তনজুড়ে হাসির হল□া। দুর্ভাগ্য, এতকাল পর সেগুলো প্রায় বিস্মৃতির অতলে। তবে মনে রয়েছে একটি বাক্য Police patrolling streets-এর অনুবাদ— 'পুলিশ রাস্তায় পেট্রোল ছড়াইতেছে' শুনে শ্রোতাদের আরেক দফা হাসি।

কর্মশালার শেষ সিদ্ধান্ত ছিল কিছু নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা প্রতিটি সংবাদপত্র দফতরে পাঠানো এবং সাংবাদিকদের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। কাজটা করা হয়েছিল, কিন্তু এ দেশে কে শোনে কার কথা। ওবায়েদ সাহেবও এ ব্যাপারে তার অবশেষ বক্তব্যে সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। লক্ষ্য আদর্শ সাংবাদিক সমাজ গড়ে তোলা যারা হবে শ্রমনিষ্ঠ, দুর্নীতিমুক্ত, হলুদ সাংবাদিকতা তাদের গ্রাস করবে না।

এ জাতীয় বিচার-বিশে-ষণে বলা যায়, ওবায়েদ-উল হক পেশাগত দিক থেকে একজন সাচ্চা আদর্শনিষ্ঠ, শ্রমনিষ্ঠ সাংবাদিক। ব্যক্তিত্ব বিচারে উদার গণতন্ত্রী, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল; সর্বোপরি মানবতাবাদী। এই শেষোক্ত পরিচয়টিরও দেখা মিলবে তার সাহিত্যিক সত্তায়, মিলবে তার আরেক পরিচয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। কারো মতে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী।

তিন

সময় বিচারে তিনি ত্রিকালদর্শী— তিনটি শাসনকালের বিচিত্র ঘটনাবলির প্রত্যক্ষদর্শী। আর পেশাগত দিক-সহ তার কর্মজীবন ত্রিমাত্রিক। প্রধানত জীবিকার টানে সাংবাদিক, অন্যদিকে কবি-লেখক এবং চলচ্চিত্রকার। প্রথমটি যদি হয় পেশা, শেষোক্ত দুটি নেশা— এবং সেটা সাংস্কৃতিক বিবেচনায়।

লিখেছেন তার□ণ্যের নেশায়ই গল্প, কবিতা, নাটক। প্রকাশিত হয়েছে 'সওগত', 'মোহাম্মদী', 'বুলবুল' প্রভৃতি পত্রিকায়। পঞ্চাশের বহু আলোচিত মন্বন্তরে (১৯৪৩) গ্রামবাংলার দরিদ্র মানুষের মৃত্যুর মিছিল বিশেষ করে রাজধানী কলকাতায় এসে— তার চেতনায় গভীর দাগ কাটে। যেমন চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীন এঁকেছিলেন তাদের নিয়ে অবিস্মরণীয় কিছু স্কেচ। তেমনি সৃজনশীল সাংস্কৃতিককর্মী ওবায়েদ-উল হক লিখলেন কাহিনি নাটক— 'দুঃখে যাদের জীবন

গড়া'।

সম্ভবত তার জীবনের অবিশ্বাস্য নাটকীয় ঘটনা চলি- শের দশকের দ্বিমাত্রিক চরিত্রের ক্রান্তিকালে একজন অখ্যাত লেখকের কাহিনি থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ, সংশি□ষ্টধারার খ্যাতিমানের সহায়তায়, যদিও মূল সাংস্কৃতিক কাজগুলো লেখকের হাতে সম্পন্ন। বিশ্বাস করা কঠিন। তখন বঙ্গে একদিকে প্রগতিশীলতার স্রোত, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার কালো ছায়া।

আমার এখনো মনে পড়ে, মফস্সল শহরে থেকেও 'উদয়ের পথে' নামক প্রগতিশীল ছায়াছবির জনপ্রিয়তার কথা। এবং আশ্চর্য, অনেকে হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না, সেইসঙ্গে 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' ছবিটিও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সম্ভবত এর প্রগতিশীল চরিত্রের কারণে। ওবায়েদ-উল হক সাহেব লিখেছেন, তিনি এই সাফল্যের পর একই ধারায় নতুন নির্মাণে উদ্দীপ্ত হন।

তার ভাষায় : 'এরপর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম দেশে সাম্প্রদায়িকতার কারণে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু নিয়েই আমার দ্বিতীয় ছবি নির্মাণ করা হবে। কাহিনি রচনার কাজ এবং শিল্পী নির্বাচনও শুর□ করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য একা আসে না— এই নিষ্ঠুর সত্যটি আবার আমার সামনে এসে দাঁড়াল পথরোধ করে। ভারত বিভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো। খ□িত ভারতের যে অংশগুলো নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে পূর্ববঙ্গ তার অন্তর্ভুক্ত। কলকাতা পুরোটাই থাকবে ভারতে। আমরা সেখানে বিদেশি।' তাই গভীর মনঃকষ্ট নিয়ে চলচ্চিত্রশিল্পী ওবায়েদ-উল হকের নিঃশব্দে কলকাতা ত্যাগ। তার চলচ্চিত্রকার জীবনের এখানেই ইতি বলা চলে।

যদি রাজনীতির ডামাডোলে, দাঙ্গা-মৃত্যু-সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণা-বিদ্বেষের অমানবিকতার কালোস্রোতে ভারত বিভাগ না হতো, কিংবা অন্ততপক্ষে বঙ্গবিভাগ না হতো অবাঞ্ছিত পথে, তাহলে হয়তো ওবায়েদ-উল হক হারিয়ে যেতেন না ছায়াছবির জগৎ থেকে। তার জন্য অন্য এক ভবিষ্যৎ রচনার সুযোগসুবিধা তৈরি হতো। আমরা দেখতে পেতাম ভিন্ন এক ওবায়েদ-উল হককে, হয়তো সাংবাদিক ওবায়েদ-উল হককে নয়।

চার

জীবন এমনই বিচিত্র। রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ঘটনা শুধু দেশ বা জাতি তথা সমষ্টির জীবনই নয়, নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির জীবনধারাও। তাই ঘটনাক্রমে কর্মহীন ওবায়েদ-উল হকের ফেনী থেকে ঢাকা যাত্রা পাকিস্তান অবজার্ভারে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণপত্র পেয়ে। জীবিকা ও পেশার হঠাৎ হাওয়ার টানে পরিবর্তন। সেই ধারা যে দীর্ঘকাল ধরে চলেছে, সেকথা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে।

তাই বলে তার সাংস্কৃতিক জীবন হারিয়ে যায়নি। ওটা যে তার চেতনায় নান্দনিক নেশা। তাই কবিতা, গল্প বা নাট্যকাহিনি লেখা যথারীতি চলেছে, প্রকাশিত হয়েছে স্থানীয় পত্রপত্রিকায়। পাকিস্তানি পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় তখন পত্রপত্রিকা, বিশেষ করে সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা অতি কম। ঢাকার সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবেশ একুশে উত্তরকাল থেকে প্রগতিশীলতায় বলিষ্ঠ হলেও এর সাংগঠনিক, অবকাঠামোগত দিক ছিল খুবই দুর্বল।

একুশের ভাষা আন্দোলন সাহিত্য সাংস্কৃতিক জগৎকে আদর্শিক উদ্দীপনা জোগালেও এর নান্দনিক দুর্বলতা অনস্বীকার্য। সেসময় যেমন একগুচ্ছ তর“ণ কবি-প্রাবন্ধিক ঢাকার পূর্ব শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেছে, তেমনি কলকাতাফেরত জ্যেষ্ঠরাও এক্ষেত্রে হাল ধরেছেন— এদের মধ্যে সাংবাদিকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। কবি-লেখকও কম না। যেমন— আবদুল হক, জহুর হোসেন চৌধুরী, আবদুল গণি হাজারি, সিকান্দার আবু জাফর, মাহবুব জামাল জাহেদী, আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, ফরর“খ আহমদ প্রমুখ। সেইসঙ্গে দ্বিমাত্রিক ভূমিকায় সাহিত্য-সাংস্কৃতিককর্মী সাংবাদিক ওবায়েদ-উল হক। এরা তর“ণদের পাশাপাশি নতুন ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন ফতেহ লোহানী, ফজলুল হক প্রমুখ। বিনোদন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শেষোক্তদের উলে- খযোগ্য ভূমিকা। সেখানেও আছেন ওবায়েদ-উল হক। তিনি স্মৃতিচারণমূলক লেখায় উলে- খ করেছেন রাবেয়া খাতুনের নাম। ফজলুল হক সাহেবকে মাঝেমধ্যে মেডিক্যাল হোস্টেলে আসতে দেখেছি তার ভাই, আমার সহপাঠী ফজলুল করিমের সঙ্গে দেখা করতে, গল্প করতে।

পঞ্চাশের সে দশকটি সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি সবকিছু মিলিয়ে

অদ্ভুত এক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। সেক্ষেত্রে ছিল প্রগতিশীলতার প্রাধান্য এবং একইসঙ্গে ভাষিক চেতনার রাজনৈতিক উন্মেষ ধন্য। সেসব কথার সাতকাহন আমার আলোচ্য বিষয় নয়।

যদি প্রশ্ন তোলা যায় সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার এবং বিশেষভাবে চলচ্চিত্রকার— এই ত্রিধা বিভক্ত ধারায় ওবায়েদ-উল হকের কোন সত্তাকে প্রধান বা এক নম্বর মার্কা দেবো, কাজটা বোধহয় প্রকৃত বিচারে কঠিনই হবে। যদিও প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায়, সবাই একবাক্যে তার সাংবাদিক সত্তাকেই প্রধান হিসেবে আখ্যায়িত করবেন। হয়তো সময় বিচারে এটাই সঠিক, তবুও প্রশ্ন থেকে যায়।

ওবায়েদ-উল হক সাহেব তার দীর্ঘজীবনে বহু পদে আসীন হয়েছেন, বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন, তার অভিজ্ঞতার ঝুলি মূল্যবান ও সমৃদ্ধ। বহু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো মানুষটির বহু গুণান্বিত ব্যক্তিচরিত্র, যা বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিরলই বটে। অনেক প্রাপ্তির উচ্চতায় এ দেশে সহজ-সারল্যের বিরলতম দৃষ্টান্ত ওবায়েদ-উল হক— তাকে আমি এভাবেই দেখি। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে অহমবোধের প্রবলতাই বহুলদৃষ্ট, যা উচ্চমননশীলতার নান্দনিক লক্ষণ নয়।

পাঁচ

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা সবই তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ, কিন্তু তাই বলে এ কথা ভুলি কেমন করে যে তিনি কবি, এ মাটির ও প্রকৃতির নিয়ম মেনে তিনিও কবিতা লিখেছেন, যেমন যৌবনে, তেমনি জীবনের সায়াহ্নবেলায়। তাই তার কবিতা সম্পর্কে কিছু কথা লেখা প্রয়োজনবোধ করছি।

আগেই বলা হয়েছে ওবায়েদ-উল হক পেশাগত জীবনে প্রধানত সাংবাদিক হলেও একইসঙ্গে তিনি কবি, নাট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা। শেষোক্ত দিকটি দেশবিভাগের ঝড়ে ওলটপালট হয়ে যায়, কিন্তু কবিতা উড়ে যায়নি বা মরেনি। জীবন-জীবিকার লড়াই ও ব্যস্ততার মধ্যেও কবিতা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে গেছে, সময়ের অনুকূল অবকাশে। এমনকি জীবনের সায়াহ্নবেলাতেও।

যখনই অবকাশ পেয়েছেন, কবিতার কলমটি হাতে তুলে

নিয়েছেন, ছাপা হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। সেগুলো সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে গেলে প্রথমেই উলে-খ করতে হয়— তার কবিতার বিচারে তার কাল ও কালিক প্রভাবে গঠিত কাব্যচেতনার কথা। সেদিক থেকে তাকে আধুনিক বলা ভুল হবে না, অনুভব-উপলব্ধির প্রকাশ বিচারে এবং শব্দ ব্যবহারের অনবদ্য সারল্যে, যা তার স্বভাববৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

জীবনসায়াহ্নে লেখা 'শেষ সংলাপ' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনেকটা স্মৃতিচারণ ও রোমন্থনের ভঙ্গিতে লেখা পঙ্‌ক্তিগুলো গদ্য সংলাপধর্মী এবং সহজসরল শব্দভাষ্যে হলেও স্পর্শকাতর মনকে ছুঁয়ে যায়, যদিও মাঝেমধ্যে শেষ দশকের রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়তে পারে, পারে মর্ত্যধূলি ও ঘাস-শিশির ছেড়ে চলে যাওয়ার বেদনাবোধের কথা।